Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশের জীবনচেতনা ও কবিতায় নারী

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Qudrat-E-Huda
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.4
Pages	৫৭-৭৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

জীবনানন্দ দাশের জীবনচেতনা ও কবিতায় নারী

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা*

সারসংক্ষেপ : জীবননান্দ দাশ [১৮৯৯-১৯৫৪] তাঁর কবিতায় নারীকে কিভাবে চিত্রিত করেছেন তার স্বরূপ উন্মোচন করাই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। কিন্তু কবিতা, কবিতার বিষয়-আশয় কবির ব্যক্তিজীবন আর কাব্য-ঐতিহ্য নিরপেক্ষ কিছু নয়। এ কারণে প্রবন্ধে কবির জীবনচেতনা ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া জীবনানন্দের পূর্বকালীন ও সমকালীন কাব্য-ঐতিহ্যের মধ্যে নারীকে দেখার ভঙ্গিটিও দেখে নেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নারীকে দেখার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি যে, এখানে নারী নানারূপে জীবনানন্দ দাশের চেতনায় ধরা দিয়েছে। তবে তাঁর নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক, পুরুষতান্ত্রিক, আধিপত্যবাদী ও প্রথাগত।

কবিতায় নারী সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, অথবা নারীকে জীবনানন্দ দাশ কিভাবে দেখতেন, তার তত্ত্ব-তালাশ করাই এই লেখায় আমাদের উদ্দেশ্য। তবে শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন, জীবিতকালে যে-কোনো মানুষ চিন্তা-চেতনার দিক থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। চিন্তার পরিবর্তন হয় না শুধু মৃত মানুষের অথবা জীবন্মৃতের। জীবনানন্দ দাশ কবিতা চর্চা করেছেন– বিরতিসহ– প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর (১৯১৯-১৯৫৪)। এই পঁয়ত্রিশ বছরে তাঁর কবিতায় ছোটবড় নানা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। 'জীবনানন্দ ৫৫-বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু মানসিকভাবে এক জায়গায় থাকেননি। তাঁর সমগ্র-সাহিত্য তার সাক্ষ্য দেবে।' (আবদুল মান্নান ২০১৫ : ৪১১) যেমন, *ঝরা পালক* (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থের ভাব-ভাষা-চেতনা পরের কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) থেকে কত আলাদা তা জীবনানন্দ-পাঠক মাত্রই জানেন। *বনলতা সেন* (১৯৪২) ও *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) আর *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮) ও *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থ জীবন-চেতনা,

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীনগর সরকারি কলেজ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

প্রকাশরীতি আর ভাষার দিক থেকে একই– একথা কোনো জীবনানন্দ-পাঠকই বোধ করি বলবেন না।[১] ফলে জীবনানন্দ দাশের নারী বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রায় সিকি শতাব্দীরও বেশি সময়ব্যাপী রচিত সব কাব্যের সব কবিতায় একই রকম ছিল– একথা কিছুতেই বলা যাবে না। তবে তাঁর মূল কবি-স্বভাবের প্রতিনিধিত্বকারী মধ্য পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলোতে– *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবী*– নারী বিষয়ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করা সম্ভব। কারণ এসব কাব্যগ্রন্থ মূলত প্রেম-প্রকৃতি-নির্ভর। এসব কাব্যের নারীভাবনাই জীবনানন্দ দাশের নারীভাবনার কেন্দ্রীয় প্রবণতা। শুধু তাই নয়, জীবনানন্দের মূল কবি-স্বভাব এই কাব্যগ্রন্থ তিনটিতেই প্রকাশিত হয়েছে বলে অধিকাংশ জীবনানন্দ-গবেষক মনে করেন। জীবনানন্দ দাশকে সমগ্র বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যে বড় কবি এবং ভিন্ন রুচির কবি মনে করা হয়, তার মূলে বোধ করি এই মধ্য পর্যায়ের কাব্যগুলোই প্রধান কারণ। অন্যান্য কাব্য এই কাব্যগুলোরই সম্প্রসারণ। তবে সম্প্রসারিত কাব্যগ্রন্থগুলোতেও জীবনানন্দের নারী বিষয়ক চিন্তা-চেতনা অন্তর্গতভাবে খুব যে বেশি পরিবর্তিত হয়েছে তা নয়।

এক

জীবনানন্দ দাশের নারীভাবনা তাঁর মূল কবি-স্বভাব বা জীবনচেতনার বাইরের কিছু নয়। জীবন-জগৎ সম্পর্কে তাঁর অপরাপর ভাবনার সঙ্গে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা গভীর মিল আছে। এজন্য তাঁর মূল কবি-স্বভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরি। স্মরণে রাখা দরকার যে, জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর যুগের আধুনিক কবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যত নেতিবাচক ফল ফলেছিল পৃথিবীব্যাপী, তার সব ভাপ-তাপ-চাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর কৈশোর আর যৌবন। যে-কোনো যুদ্ধের প্রধান প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এটি পৃথিবীর পুরনো মূল্যবোধকে ভেঙে দেয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের তাল (harmony) নষ্ট হয়ে যায়। স্বার্থপরতা স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়ে মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভালোর সংজ্ঞার্থ যায় বদলে; প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিস্বার্থের দাপট। পুরনো সব কিছুই দারুণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়; হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পুরনো অনেক বিশ্বাসের প্রাসাদ। জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর সমসাময়িক অপরাপর কবিদের– অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখের– ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের খোল-নলচে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের অংশভুক ছিলেন জীবনানন্দ দাশও। 'বিগত যুগের মূল্যবোধগুলি বর্তমান যুগে অচল, এ-কথা জীবনানন্দ একাধিকবার বলেছেন।' (দীপ্তি ১৯৯২ : ১৪০) তিনি যুগের উদ্ভ্রান্তি দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত ছিলেন যে, তাঁকে অনেকে বলেন, 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি'। (দীপ্তি ১৯৯২ : ১১৭) জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন সংগত কারণেই হতাশাবাদী। মৃত্যুই ছিল তাঁর আরাধ্য। কবিতায় মৃত্যুকে তিনি 'বন্ধুর মত

ডেকেছেন', 'প্রিয়ার মতন' ডেকেছেন। জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই স্বস্তিদায়ক মনে করেছেন ('আট বছর আগের একদিন', *মহাপৃথিবী*)। 'না এলেই ভালো হত অনুভব করে' তিনি পৃথিবীতে এসেছেন বলে কবিতায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ('সুচেতনা', *বনলতা সেন*)। কারণ তিনি মনে করতেন 'আমাদের প্রাণ/পথের আহত/মাছিদের মতো!' ('কয়েকটি লাইন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*) আলোর চেয়ে অন্ধকারই তাঁর বেশি প্রিয়। 'জীবনানন্দের কবিতায় তমসা আর অন্ধকারের বিচিত্র ভুবন শিল্পিত হয়েছে; তাঁর কবিতায় অন্ধকারই হয়ে উঠেছে আপন সত্তা-প্রকাশের আশ্রয়।' (বিশ্বজিৎ ২০০২ : ১৬) 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর, অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে' চেয়েছেন তিনি ('অন্ধকার', *বনলতা সেন*)। 'অবসরের গান' (*ধূসর পাণ্ডুলিপি*) কবিতায় তিনি কাজের চেয়ে অবসরকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কবির ভাষায়–

> এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো,– ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
> উদ্যমের ব্যথা নাই,– এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
> এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
> মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
> এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
> রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
> ভালোবাসা আসিবে না,–
> জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ৮৪-৮৫)

'উৎসাহের ব্যথা', 'উদ্যমের ভাবনা', 'উত্তেজনা', 'ক্রোধ', 'অবরোধ', 'ক্লেশ', 'কোলাহল'– জীবনানন্দ দাশের পছন্দ নয়। এরচেয়ে মৃত্যু শ্রেয়; আত্মহত্যা শ্রেয়।[২] জীবনের বিচিত্র উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে না থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত ঘুমই তাঁর আরাধ্য–

> জানি– তবু জানি
> নারীর হৃদয়– প্রেম– শিশু– গৃহ– নয় সবখানি;
> অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে;
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত– ক্লান্ত করে;
> লাশকাটা ঘরে

> সেই ক্লান্তি নাই;
> তাই
> লাশকাটা ঘরে
> চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে। (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৫-৮৬)

অথবা আবার দেখি *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের 'প্রেম' কবিতায় মৃত্যুর শান্তির মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে কবি এভাবে উদ্বেল হয়েছেন– 'কারণ, সাম্রাজ্য– রাজ্য– সিংহাসন– জয়–/মৃত্যুর মতন নয়,– মৃত্যুর শান্তির মতো নয়! ... মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যত দিন,– তাই,– / ক্লান্তির পরে ঘুম,– মৃত্যুর মতন শান্তি চাই।' (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১০৩) 'স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো' ('স্বপ্নের ধ্বনিরা, *বনলতা সেন*)– একথাও জীবনানন্দ দাশ বলেছেন। তিনি মনে করতেন–

> যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
> এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
> ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৩)

এই হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের জীবন চেতনার কেন্দ্রীয় প্রবণতা। অনেকে অবশ্য জীবনানন্দের এই মৃত্যু, ব্যথা, আঁধার আর ঘুমের প্রতি তীব্র টানকে জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তিরই নামান্তর বলতে চেয়েছেন–

> জীবনানন্দ তাঁর লেখায় চিন্তায় সর্বাধিক সমাজসংসার দ্বারা যন্ত্রণাবিদ্ধ, ইতিহাসপুরুষের স্বেচ্ছাচারে উৎপীড়িত, জীবনধারণপ্রক্রিয়া নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত; এবং তাঁর নিদ্রা প্রেম মৃত্যুচিন্তা জীবনসংলগ্ন থাকার সনির্বন্ধ প্রয়াসেরই নিজস্ব মুকুরপ্রক্ষিপ্ত আলোয় কালোয় মেশানো ছবি। (ভূমেন্দ্র ২০১১ : ৮)

কিন্তু জীবনানন্দের মধ্য পর্যায়ের কবিতায় জীবনের নেতির প্রতি এত তীব্র আসক্তি যে, এটাকে তাঁর চেতনার মূল প্রকৃতি বলেই মনে হয়। তিনি তো দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, সূর্যের আলোয় প্রকাশিত মানুষের স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, উদ্যম, চিন্তা, কাজ দেখে তাঁর মনে হয় 'কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদ'; 'উৎসব'। তিনি বলেছেন, 'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত'। তবে হ্যাঁ, মধ্য পর্বের সমস্ত কবিতাতেই জীবন-মৃত্যুর, আলো-অন্ধকারের, 'শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব'; দ্বৈরথ দুর্লক্ষ্য নয়। (সৈয়দ আজিজুল ২০০৬ : ৫১) এদিক থেকে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কবির মৃত্যু-ঘুম-অন্ধকার-প্রিয়তার বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়। তবে জীবনানন্দ দাশের শেষ দিকের কাব্য-কবিতায় জীবনের উদ্‌বোধনের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিককার কবিতার তিমিরবিলাসিতার বদলে শেষ দিককার কবিতায় 'তিমিরবিনাশী' চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। মধ্য পর্বের জীবনযন্ত্রণার বোধ থেকে উৎসারিত হতাশাই হয়তো শেষ পর্বে তাঁর মধ্যে জীবনের উদ্‌বোধন ও জীবন সম্পর্কে আশাবাদিতার

চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে। তবে মধ্য পর্বের কবিতায় আশাবাদিতা জীবনানন্দ দাশের কেন্দ্রীয় প্রবণতা নয়। যাহোক, জীবন সম্পর্কে যে-মানুষ অন্তর্গত চেতনায় নেতিবাচক, যিনি জীবনের কর্ম, উদ্যোগ, প্রেরণা, উৎসাহ, তৎপরতা, স্বপ্ন ইত্যাদির ব্যাপারে নিরুৎসাহী; তাঁর কাছে নারী, প্রেম, নারীপ্রেম ইত্যদির অবস্থান ও মূল্যায়ন কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই আলোকেই আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকাশিত তাঁর নারী ভাবনার স্বরূপ দেখতে চাইব।

দুই

জীবনানন্দ দাশের পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ কবির রোমান্টিক চেতনায় নারী ও নারীপ্রেম ছিল পরম আরাধ্য একটি বিষয়। তাঁদের দৃষ্টিতে নারী যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারীকে দেবীর আসনেও বসিয়েছেন। আর এঁদের প্রেম সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, প্রেম শাশ্বত। 'রোম্যান্টিক কবিদের শাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দর বিশ্বাস নেই।' (দীপ্তি ১৯৯২ : ১২৬) মোটকথা নারী জীবনানন্দের আগে চিত্রিত হয়েছে রোমান্টিক ভাবনা-কল্পনার অংশ হিসেবে। অবশ্য রোমান্টিক ভাবনা-কল্পনার বাইরে গিয়েও ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দৃষ্টিক্ষেপ করে নজরুল নারীকে সাম্যবাদের দৃষ্টিতেও দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের প্রজন্মে এসে; বিশেষত ত্রিশের দশকের কবিদের কাছে; নারী তাঁর তাৎপর্য অনেকটাই হারিয়েছে। এই প্রজন্মের জীবন চেতনার আরশিতে এমন জটিল ও নেতিবাচক প্রত্যয় ঢুকে পড়েছে যে, নারী সেখানে গৌণ ও শরীর সর্বস্বতার চোরাবালিতে আটকে গিয়েছে। প্রেম সম্পর্কে পুরনো শাশ্বতের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে জীবনানন্দরা প্রেমকে দেখেছেন ক্ষণিক একটি বিষয় হিসেবে। প্রেম সম্পর্কে জীবনানন্দ যেমনটি বলেছেন 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে পায় নাক আর'। আবার তিনি এও বলেছেন যে, 'প্রেম রাত বারোটার বেশি জাগিতে পারে না'। 'যে-প্রেম তিনি পাননি, যে-প্রেম শেষ হ'য়ে গিয়েছে, যা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি।' (দীপ্তি ১৯৯২ : ১২৪) আরো দেখে নেয়া যেতে পারে জীবনানন্দ দাশের প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা–

> একদিন– একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
> একরাত– একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
> একদিন– একরাত;– তারপর প্রেম গেছে চ'লে,– (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১০৫)

প্রেম সম্পর্কিত এই ক্ষণবাদী চেতনার কারণে প্রেম সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ ত্রিশের দশকের অপরাপর কবিদের মতো হয়ে উঠেছেন শারীরিক। একারণে তাঁর কবিতায়

'দেহ' এবং 'শরীর' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৩] তাঁর কবিতায় 'হৃদয়' শব্দেরও বহুল প্রয়োগ থাকলেও এই 'হৃদয়' বিশুদ্ধ প্রেমের প্রসঙ্গে রোমান্টিক কবিরা যে-অর্থে ও যেভাবে ব্যবহার করেন সেই অর্থে ও সেভাবে তিনি ব্যবহার করেননি। যেমন, *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের '১৩৩৩' কবিতায়–

তোমার শরীর,–
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;– তারপর, মানুষের ভীড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,– হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;– ছিঁড়ে গেছি,– ফেঁড়ে গেছি,– পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল,– গেল,– হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব;– সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,– সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১০২)

কিন্তু এবিষয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১১) জানাচ্ছেন, 'জীনানন্দের প্রেমে শারীরিকতা নেই, আধ্যাত্মিকতাও নেই। আছে এক অন্তহীন বোধ ও চেতনা, যাকে কবি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন জীবনের সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থিমোচনে। (আবদুল মান্নান ২০১১ : ২৫২) মান্নানের এই পর্যবেক্ষণ প্রেমের ক্ষেত্রে ঠিকই মনে হয়, কিন্তু সেই প্রেমে নারীর বিষয়টি মনে রাখলে দেখা যাবে, নারীকে শরীর হিসেবেই জীবনানন্দ বিবেচনা করেছেন। নারী-শরীরের সম্ভোগ নেই তাঁর কবিতায়, কিন্তু নারী এবং নারীর উপস্থিতি বলতে তিনি 'দেহ' আর 'শরীর' স্বর্বস্ব নারীকেই বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ নারী-প্রেম বলতে জীবনানন্দ 'শরীর' এবং ক্ষণিকতাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। 'ক্ষণিকতা, কিন্তু ক্ষণিকতার উত্তরে প্রেমের চিরন্তনতা দেখা দিল *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে*।' (আবদুল মান্নান ২০১১ : ২৪৫) মান্নান সৈয়দের এই বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে জীবনানন্দ বোধ হয় *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যে এসে নারী-পুরুষের শাশ্বত প্রেমের কথা বলেছেন। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে এটি ঠিক নয়। প্রেমের শক্তি, চিরন্তনতা বা শাশ্বততা সম্পর্কে জীবনানন্দের কখনোই কোনো সংশয় ছিল না। যেমন–

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন!
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি,– তোমার আসন

সকল স্থলের 'পরে,– সকল জলের 'পরে আছে!
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম তোমার!– যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ!– অঙ্কুরের মতো তুমি,– যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে!– তুমি ঢেউ,– হাওয়ার মতন!
আগুনের মতো তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে!
আশার ঠোঁটের মতো নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১০৪-১০৫)

লক্ষণীয় এই প্রেম নারীপ্রেম নয়। এই প্রেম নারী-পুরুষের সম্পর্ক-নিরপেক্ষ আদর্শিক প্রেম। প্রেম এখানে একটি চেতনা। বিষয় বা চেতনা হিসেবে যে প্রেম তাতে নয়, তাঁর গভীর অবিশ্বাস ছিল নারীর সঙ্গে পুরুষের অথবা পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রেমের বিষয়ে। নারী-পুরুষের প্রেম বিষয়ে তিনি সর্বদাই ক্ষণবাদী ছিলেন। আর নারী-পুরুষের প্রেমে নারীকে শারীরিকভাবেই বিবেচনা করতেন।

নারী-পুরুষের বাস্তবিক প্রেম 'চিরন্তন'– একথা জীবনানন্দের সমগ্র কবিতা কেন, সমগ্র কথাসাহিত্যও বোধ হয় সাক্ষ্য দেবে না। আদতে মানবের সঙ্গে মানবীর প্রেমের প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, তখনই তিনি নারীকে রূপগর্বিতা আর শরীরসর্বস্বতার মধ্যেই দেখেছেন; আর হয়ে উঠেছেন ক্ষণবাদী। ঠিক ত্রিশের আরেক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো–

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবনে তোমার:
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে। (সুধীন্দ্রনাথ ১৯৯৭ : ৩৮)

এভাবে আমরা লক্ষ করি, নারীকে দেখার ক্ষেত্রে এবং নারীপ্রেম সম্পর্কিত ধারণার দিক থেকে জীবনানন্দ দাশ তাঁর পূর্বজ কবিদের থেকে স্বতন্ত্র।

তিন

স্ত্রী ব্যতিরিক্ত প্রেম জীবনানন্দের ছিল একথা কোথাও জানা যায় না। তবে দিল্লিতে 'শিক্ষকতাকালেই উন্মোচিত হয় গোপন প্রেমিকার সাংকেতিক নাম 'Y'। এই 'Y'-এর সঙ্গে জীবনানন্দের দ্বিধাযুক্ত অপ্রকাশ্য প্রেম ছিল ছিল বলে তাঁর দিনলিপি ঘেঁটে গবেষকরা অনুমান করেছেন। (সিরাজ ২০০৯ : ৪২০) তবে তাঁর জীবনীকার-গবেষক সবাই মোটামুটি একমত যে, নারীসম্পর্কিত বিষয়ে 'তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক পুরুষ'।[৪] (আকবর ২০১৬ : ৭৪) অবশ্য বিভিন্ন স্মৃতিকথা সূত্রে জীবনানন্দের

দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। জীবনানন্দ এবং তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশ ছিলেন জীবন-যাপন আর জীবন-বোধের প্রশ্নে সম্ভবত সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনানন্দ দাশের জীবনচেতনা এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ জীবন-যাপন প্রণালী সহজেই অনুমেয়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন শিক্ষিত কিন্তু জীবন-চেতনায় আর যাপন সম্পর্কিত ধারণায় একেবারেই প্রথাগত; আর দশজন সাধারণ নারীর মতো। 'লাবণ্য দাশ মানুষটি ছিলেন সাদাসিধে পার্থিব। কবিতা তিনি একেবারেই বুঝতেন না। কবিতা রচনা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটাও তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।' (মিনু ১৪০১ : ৩৩২) তবে 'কবির স্ত্রী বলে তাঁর একটা গর্ব ছিল'। এই গর্বের বিষয়টি তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে কেউ বলেননি। মিনু সরকার (১৪০১) জানিয়েছেন, লাবণ্য দাশের মুখে জীবনানন্দ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ তিনি শুনেছেন। লাবণ্য দাশের দাম্পত্যজীবন যে সুখের ছিল না একথা তিনি অনেকবার নিকটজনদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। স্ত্রী লাবণ্য দাশের ওপর জীবনানন্দ দাশের খুব যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তেমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও পাওয়া যায় না। জানা যায়, লাবণ্য দাশ প্রায়ই রাত করে বাড়িতে ফিরতেন। স্ত্রীর সাথে জীবনানন্দের ঘরের সম্পর্ক বোঝা যাবে জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠজন ভূমেন্দ্র গুহের (২০১১) এক স্মৃতিচারণে। তিনি প্রায়শ জীবনানন্দের কলকাতার বাসায় যেতেন। জীবনানন্দ ছাড়াও জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশের– যাকে জীবনানন্দ অত্যন্ত স্নেহ করতেন– সঙ্গেও তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত জীবনানন্দ দাশের পাশে হাসপাতালে সেবার জন্য দুর্ঘটনার দিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত টানা আটদিন ভূমেন্দ্র গুহ ছিলেন পরিবারের সদস্যের মতোই। অথচ জীবনানন্দের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই তৈরি হয়নি। তিনি বলছেন–

> জীবনানন্দের বাড়িতে আমি কোনও দিন চা খেয়েছি, মনে করতে পারি না। জীবনানন্দের স্ত্রীকে দেখেছি, ব্যস্ত মানুষ, দেখা হতেই সামনে থেকে সরে গেছেন; তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে কোনও দিন কথা হয়নি। মেয়ে মঞ্জুশ্রী আমার বয়সী বা আমার চাইতে সামান্য বড়, পরে কথঞ্চিৎ মৃদু আলাপ-পরিচয় হলেও, সে-পর্যায়ে, দেখা হলে, পারস্পরিক সামান্য হাসি বিনিময়ের চেয়ে বেশি কথাবার্তা তাঁর সঙ্গেও আমার হয়নি। ছেলে রঞ্জু নিজের মনে একা; তাঁর চলায়-ফেরায়, হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায়, হঠাৎ বাবার বা পিসির কাছে এসে কথা বলতে শুরু করে কথা শেষ না করতে পারায় বোঝা যেত যে, তাঁর কৈশোর-যৌবন-গ্রন্থি-সমাবৃত পৃথিবীতে কোথাও একটা চিরাচরিত গিঁট পড়ে গেছে, তাঁর মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে। (ভূমেন্দ্র ২০১১ : ৬)

অর্থাৎ জীবনানন্দের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আদৌ স্বাভাবিক ছিল না। বোধ করি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অস্বাভাবিকতা সন্তানদের স্বাভাবিক বিকাশে, সামাজিক চেতনা গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে লাবণ্য দাশের উদাসীনতা আর অপ্রাপ্তিজনিত হাহাকার বোঝা যায়

জীবনানন্দের মৃত্যুদিনে লাবণ্য দাশের এক বক্তব্যে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর হাসপাতালে জীবনানন্দের মৃত্যু হলে, পরদিন তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে আসেন 'তা-বড় তা-বড় সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সমালোচক-চিন্তাবিদরা'। মৃতবাড়ির এই ভিড়ের মধ্যে ভূমেন্দ্রের বয়ানে ভূমেন্দ্র-লাবণ্যের এসময়ের কথাগুলি ছিল এমন–

> আর এক সময়ে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ আমাকে ঝুল বারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তা হলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক-কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কী রেখে গেলেন বলো তো! (ভূমেন্দ্র ২০১১ : ২১)

জীবনানন্দ দাশের অভিযোগ ছিল আরো গুরুতর। বিরাম মুখোপাধ্যায় (১৪০১) বলেছেন–

> একদিন হঠাৎ [জীবনানন্দ] আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি স্ত্রী আপনার আমন্ত্রণে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাবে সায় না দেয় কী করবেন? কী করা উচিত? দাম্পত্য সম্পর্কের যে অস্বাভাবিকতার বীজ এই প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে সেই অস্বাভাবিকতা কবির পারিবারিক জীবনে লক্ষ্য করেছিলাম। আমি বেশ বয়োকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ প্রায় বন্ধুর মতো এইসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমি নির্মন্তব্য শুনে যেতাম। শুনেছি, শ্রীমতি জীবনানন্দ নাকি প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন বেশি রাত করে। জীবনানন্দের মধ্যে সবসময়ে ম্রিয়মাণতাও লক্ষ্য করেছি। (বিরাম ১৪০১ : ৩০৫)

তবে এতৎসত্ত্বেও স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে বোধ করি একধরনের 'সহানুভূতি' বা মায়া ছিল। 'টাকা নারী রাষ্ট্র' শিরোনামের এক অগ্রন্থিত গদ্যে জীবনানন্দ বলেছেন–

> রাষ্ট্র অবিশ্যি বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন করে। কিন্তু সে-পথ দীর্ঘ ও দুর্গম। সে-পথ অতিক্রান্ত হলেও উপলব্ধি করতে হয় যে, যে-স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এতদিন অনেকটা নিস্প্রেমেই জীবন কেটে গেছে – তাকে ভালোবাসতে পারা গেল না বলে সরিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু করুণা ও সহানুভূতি আন্তরিকভাবে তাকে ছাড়া আর কাকে দেওয়া সম্ভব? যে-মানুষ সহানুভূতি ও করুণা না বিতরণ করে পারে না (মানবতা দাবি করে কেউ কি তা পারে?) তার দুশ্চিন্তার কি কোনো অন্ত আছে? (আবদুল মান্নান ২০১১ : ৪১৫)

জীবনানন্দ দাশের মধ্যে উপর্যুক্ত বোধ ছিল বলেই বোধ করি লাবণ্য দাশ কখনো কখনো বলতেন যে, জীবনানন্দ তাঁকে ভালোও বাসেন। এমন কি মিনু সরকারের মতো ঘনিষ্ঠজনদের কাছে কখনো কখনো তিনি বলতেন যে, 'বনলতা সেন আসলে তিনিই'।

উপর্যুক্ত এইসব সময়ের বাস্তবতা, সাহিত্যিক বাস্তবতা, জীবনচেতনা আর যাপিত জীবনের বাস্তবতার মধ্যে জীবনানন্দ দাশ কাব্য-কবিতা চর্চা করেছেন। এইসব বাস্তবতার মধ্যেই নারীকে দেখেছেন আর শিল্পিত করেছেন।

চার

নারী বিষয়ে প্রথাগত 'আদিখ্যেতা' জীবনানন্দের কবিতায় কখনোই ছিল না। নারী নিয়ে তীব্র আলোড়ন বোধ করেছেন এমন কোনো সাক্ষ্যও তাঁর কবিতায় দেখা যায় না। নজরুল যেমন তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতায় কাঙ্ক্ষিত নারীর অনুপস্থিতিজনিত বিরহে তীব্রভাবে আলোড়িত হয়েছে, অথবা যেমন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনাজগতের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল নারীভাবনা; জীবনানন্দে তেমনটি কিছুতেই নয়। এর মূল কারণ হয়ত রোমান্টিক চেতনা আর আধুনিকতাবাদী চেতনার ভিন্নতা। জীবনানন্দ নারী বিষয়ে যথেষ্ট অরব, সমিত, নিম্নস্বর। যদিও তাঁর জনপ্রিয় অর্থে বিখ্যাত কবিতার একটা বড় অংশের নামকরণ করা হয়েছে নারীর নামে। এজন্যে অবশ্য বিভ্রান্তিটা বেশি। অনেকের ধারণা হয়েছে জীবনানন্দ বুঝি-বা নারী বিষয়ে অতি আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু সমগ্র জীবনানন্দ ঘাটলে দেখা যাবে বিষয়টি ঠিক উল্টো। শুধু কাব্যজগতে নয় ব্যক্তি জীবনেও তাঁর চেতনার মধ্যে নারী বিষয়ক অতি আগ্রহের কথা জানা যায় না। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। কিন্তু অন্য এক বা একাধিক নারীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন বা আকাঙ্ক্ষা করেছেন কোনো নারীকে– এমন তথ্য জানা যায় না। তিনি মনেই করতেন যে, 'অমুক মহিলাকে দেখে মন কেমন করে। কিন্তু এ মন-কেমন-করা অন্তহীন দুশ্চিন্তার জননী।' (জীবনানন্দ ২০১৪ : ৪১৫) কবিতায় এবং জীবনে প্রকৃতপক্ষে নারী জীবনানন্দে খুব বেশি জায়গা করে থাকেনি। জীবনানন্দের কবিতা লক্ষ করলে দেখা যাবে, নারী অধিকাংশ কবিতায় উপলক্ষ। তাঁর লক্ষ হয় প্রকৃতির সম্ভোগ নতুবা জীবন জগৎ সম্পর্কিত কোনো গভীর পর্যবেক্ষণ অথবা সভ্যতা-ইতিহাস বিষয়ে কোনো দৃষ্টিপাত। পুরোপুরি প্রেমের কবিতা বা নারী-নামের শিরোনামযুক্ত অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। নারী তাঁর কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতায় ব্যবহৃত টেকনিক্যাল ট্রাডিশন আকারে এসেছে। কাঙ্ক্ষিতকে, বা কহতব্যকে নারী আকারে কল্পনা করে কবিতাকে পাঠক-শ্লিষ্ট করে তোলার যে ট্রাডিশন সারা পৃথিবীর কবিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়, জীবনানন্দের কবিতায় নারী বেশিরভাগ সময়ে এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। এটিকে সজনীকান্ত দাস বলেছেন 'কবিতা বিপনন কৌশল'। (উদ্ধৃত, আকবর ২০১৬ : ৭৩) একারণে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নারীর তেমন কোনো রূপকল্প খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবু যেভাবেই তিনি নারীকে কবিতায় উপস্থাপন করে থাকুন না কেনো, এ থেকে নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিচয় তো পাওয়া সম্ভব।

জীবনানন্দের কবিতায় উপস্থাপিত নারী সব জায়গায় এক রকম নয়– একথা আমরা আগেই বলেছি। সব জায়গায় একইরকম হতেও পারে না। এমন কি কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি নারী বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ, তিনিও নারীকে সব জায়গায় একভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। কোথাও তিনি নারীকে দেখেছেন সাম্যের চোখে। কোথাও দেখেছেন ন্যায্য হিস্যা আদায়ের সংগ্রামে দ্রোহীর দৃষ্টিতে। আবার কোথাও দেখেছেন পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট নারীর করুণ রূপ। নারী সম্পর্কে এই সচেতনতা বাংলা কবিতায় খুব কম কবির মধ্যেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই নজরুলই যখন নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম-অপ্রেমের অনুভবের মধ্যে এনে দেখেছেন, তখনই নারীকে আবিষ্কার করেছেন অবিশ্বস্ত, 'এক পেয়ে খুশি নয় যাচে বহুজন' হিসেবে; প্রথাগতভাবে। ঠিক একইভাবে জীবনানন্দ দাশও নারীকে একেক সময়ে একেকভাবে দেখেছেন। তাঁর নারীকে দেখার কয়েকটি প্রবণতা নির্দেশ করা সম্ভব। নারী কখনো অবিশ্বস্ত-সুযোগসন্ধানী, শরীর-সর্বস্ব, বিবর্ণ-বীভৎস, করুণ আবার কখনো আশ্রয়-প্রশ্রয়ের নীড়; পৃথিবীর সভ্যতা-সুচেতনা আর প্রজ্ঞার প্রতিরূপ।

ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত প্রেম-অপ্রেমের মতো ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির মধ্যে কবিতায় জীবনানন্দ দাশ যখন নারীকে দেখেছেন বা রূপায়িত করেছেন, তখন নারী ব্যতিক্রম বাদে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর আভাস আমরা প্রবন্ধের শুরুর দিকে দেয়ার চেষ্টা করেছি। এসব ক্ষেত্রে নারীকে জীবনানন্দ দেখেছেন অবিশ্বস্ত আকারে। নারী সুবিধাবাদী; প্রেমের প্রশ্নে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্নে নারীর মধ্যে বিশ্বস্ততা আর ব্যক্তিত্বের ঘাটতিই জীবনানন্দ দাশ লক্ষ করেছেন। উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

> চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
> আমার এ-পথে– কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
> জানি আমি,– আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
> তারপর,– কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি।– তাই আস নাই
> আমার এখানে তুমি আর। (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১০১)

নারী শুধু সম্পর্কের ব্যাপারেই অবিশ্বস্ত নয়, সে প্রতারকও বটে। নারীর রূপ বা আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সান্নিধ্যে যাওয়া মানেই আত্মহননের পথ বেছে নেয়া। নারীর এই মূর্তিটি অঙ্কিত হয়েছে 'ক্যাম্পে' কবিতায়। কবিতায় প্রেমিক পুরুষহরিণ যেমন ঘাইহরিণীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতারিত হয়েছে, তেমনি কবিও নারীর কাছে প্রতারিত হয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় আমরা লক্ষ করি 'জীবনানন্দ নিজেও ক্রমে হয়ে উঠেছেন এই পুরুষহরিণ।' জীবনানন্দ দাশও প্রতারক নারীর সান্নিধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন 'প্রতারিত প্রেমিক হিসাবে'। (জহর ১৯৯৯ : ১৪৭) কবিতায় লক্ষ করা যাক–

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়– দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?
আমার হৃদয়– এক পুরুষহরিণ–
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়– চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে কোনো এক বসন্তের রাতে ? (জীবনানন্দ ২০১৪ : ৮৭)

নারীর রূপের প্রতি মুগ্ধতা-দুর্বলতা অপরাপর কবিদের মতো, অথবা বলা যায় সব পুরুষের মতো জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও ছিল। যদিও জীবনানন্দ দাশের নারীরূপের রুচি আর দৃষ্টিটি বেশ ভিন্ন। 'বনলতা সেন' কবিতার বনলতার রূপের বিষয়টি মাথায় রেখে *মহাপৃথিবী* কাব্যের 'আদিম দেবতারা' কবিতা থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে–

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ; (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৭)

কিন্তু কবি পরক্ষণেই বলছেন, 'স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু/ তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ;/ আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।' কবি তাঁর নারী সম্পর্কিত শরীরকেন্দ্রিক ভাবনায় ভর করে পরমুহূর্তেই নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না–
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে– ব্যবহৃত– ব্যবহৃত– ব্যবহৃত– ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত– ব্যবহৃত–
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠলো :
'ব্যবহৃত– ব্যবহৃত হ'য়ে শুয়োরের মাংস হ'য়ে যায়?' (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৭)

'ব্যবহৃত' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি কি তবে নারীকে বহুগামিতার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন! তা যদি না-ও ধরি, তাহলেও কবি যে নারীকে শিল্প-নাদান, হৃদয়হীন, স্থূল-শরীরসর্বস্ব হিসেবে আবিষ্কার করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উদ্ধৃতাংশে যে-নারীকে জীবনানন্দ দাশ আবিষ্কার করেছেন, সে-নারী 'দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না'। 'স্থূল হাতে ব্যবহৃত' হয়, সূক্ষ্ম হাত, শৈল্পিক হাত চেনে না। নারীর রুচি আর চৈতন্য সম্পর্কে এই হলো জীবনানন্দের ধারণা। নারী সম্পর্কে তাঁর এই বোধের উৎস কি তবে রূপবতী স্ত্রী লাবণ্য দাশ! কারণ লাবণ্য দাশের সাফসাফ কথা ছিল 'আমি কাব্যজগতের ধার ধারি না। কবিতার চাইতে সংসারকেই বেশি ভালোবাসি। ... স্বভাবে আমি চিরকাল কবির একবারে উল্টো।' (উদ্ধৃত, সিরাজ সালেকীন ২০০৯ : ৪১৯) 'নগর-বন্দর ঢের খুঁজে' তারপর কাঙ্ক্ষিত নারীর 'জানালায় থেমে' কবি হতাশ হয়ে আবিষ্কার করলেন যে, 'ধোঁয়া সব;– তুমি যেন মরীচিকা– আমি মরুভূমি–'। একই কাব্যের 'স্থবির-যৌবন' কবিতা থেকে–

শীতের বাতাস নাকে চ'লে গেলো জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খ'সে;
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু? দেহ শুধু? শুধু হরিণীকে
বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে– নিম্নে– রাতে? (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৮)

একই কবিতায় কবি 'মাংস' আর নারীকে সমার্থক করে তুলেছেন এই বাক্যে– 'হয়ত সে মাংস নয়– এই নারী'। নারীকে ভেতরগতভাবে কবি যখন দেউলিয়া আকারে উপস্থাপন করেছেন, তখনই প্রায়শ নারীর বাইরের রূপে কবি আবিষ্কার করেছেন বিকৃতি, বীভৎসতা আর লাবণ্যহীনতা। একারণে 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/দুইখানা হাত তার হিম;/... স্তন তার/ করুণ শংখের মতো'। আরো উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

চেয়ে দেখি,– দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখ দুটো চুন-চুন,– মুখ খড়ি-খড়ি!
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,–
সব বাসি, সব বাসি,– একবারে মেকি! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ৭৭)

অনেক জায়গায় নারীকে কবি বহিরাবরণে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করলেও তার 'ভেতরে অসুখ' দেখেছেন। নারীর বহিরাবরণ কৃত্রিমও বটে–

শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখে বুকে,

দিন যাহাদের অসাধে,– অসুখে!–
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,– ভিতরে অসুখ!
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে!– (জীবনানন্দ ২০১৪ : ৭৬)

নারীর রুচি ও হৃদয়হীনতা সম্পর্কে এহেন ক্ষুব্ধতা যাঁর তিনিই তো আঁকবেন নারীর বিকৃত-বীভৎস রূপ।

নারীর বীভৎস-কুৎসিত অন্তর-বাহির আবিষ্কারের বাইরেও নারীকে আরো একটি দৃষ্টিতে দেখেছেন জীবনানন্দ দাশ। এই দেখাকে বলা যায়, করুণার দৃষ্টিতে দেখা। নারীকে তিনি মাঝে মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন করুণভাবে। নারী যেন এক করুণ চরিত্র। নারীর রূপে, বচনে আর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যেন কী এক অব্যাখ্যেয় বেদনা, করুণাকে আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দ দাশ। এক্ষেত্রে নারীর প্রতি তিনি যেন সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন। এই সহানুভূতির উৎস অনির্ণিত। নারীর মধ্যে লুকানো অকথিত বেদনাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। করুণা, বেদনা, অনির্বচনীয় হাহাকারের আধার যে-নারী তার কিছু রূপকল্প লক্ষ করা যাক। *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'তোমরা যেখানে সাধ'। এই কবিতায় কবি এই বাংলায় রয়ে যেতে চান। এখানে থেকে তিনি এমন কিছু দেখতে চান যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। অনেক কিছু দেখবেন বলে কবি কবিতার এক পর্যায়ে বলছেন–

দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ– শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবিতাংশের কান্না-করুণতা সব শঙ্খের। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবিতাংশের নারীর অন্তর্গত বেদনা বা সকরুণতার প্রভাব পড়েছে তার হাতের শঙ্খের ওপর। শুরুতেই কবি নারীর অন্তর্গত বেদনা আর সকরুণতা আবিষ্কার করেছেন নারীর হাতে। কবির ভাষায় 'দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ'। আসলে নারীর অন্তর্গত বেদনারই প্রকাশ ঘটেছে তার হাতে আর শঙ্খে। এভাবে জীবনানন্দের মনোজগতে বিরাজমান নারীর ধারণার মধ্যে বেদনাচ্ছন্ন, সকরুণ নারীর অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই বিষয়টি বেশি বোঝা যায় তিনি যখন নারীর রূপের বর্ণনা দেন তখন। উদাহরণ দেখা যেতে পারে জীবনানন্দের কবিতা থেকে–

(ক) বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৫৮)

(খ) চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!

স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো– দুধে আর্দ্র–... (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৫৮)

(গ) তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব–
শ্যামলী, করেছি অনুভব। (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৬৪)

(ঘ) কী ভয়াবহতম নির্জন রূপ (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৮৭)

(ঙ) ... পৃথিবীতে ম্রিয়মাণ গোধূলি নামিলে
নদীর নরম মুখ দেখা যাবে– মুখে তার দেহে তার কত মৃদু রেখা
তোমারি মুখের মতো; ... (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৪৭)

(চ) তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতন তার ম্লান চোখ মনে আসে (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৫৭)

নারীর রূপ কল্পনার এই প্রবণতা থেকে মনে হয়, জীবনানন্দ 'নারী'-কে ব্যক্তিগত পাওয়া-না-পাওয়ার বাইরে যখন দেখেছেন তখন তাকে অসহায়, বঞ্চিত, অকথিত বেদনার আকর হিসেবেই দেখেছেন। একারণেই বোধ করি তাঁর প্রথম কাব্য *ঝরা পালক*-এর 'পতিতা' কবিতার শেষে বলেছেন–

সে যে মন্বন্তর, – মৃত্যুর দূত, – অপঘাত, – মহামারী,–
মানুষ তবু সে, – তার চেয়ে বড়ো, – সে যে নারী, সে যে নারী! (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৩৬)

নারীকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রথাগত সন্দেহ নেই। এই দেখার মধ্যে নারী এমনভাবে উপস্থাপিত যে, নারী দুর্বল এবং ব্যক্তি হোক বা পরিবার হোক বা সমাজ হোক যেখান থেকেই হোক সে বঞ্চিত হয়; সে বেদনার আকর হয়ে ওঠে। সে দুঃখিনী। তার প্রতি সহানুভূতি দেখানোটা একটা মানবিক দায়িত্ব। জীবনানন্দ দাশের নারী বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিটি হুবহু এমন নয়। নারীর বেদনার কারণ এখানে অনুক্ত বলে এক ধরনের কাব্যিকতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু নারীর অবস্থা আর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু এর বাইরেও জীবনানন্দের কবিতায় নারীর অন্য রূপ লক্ষ করা যায়। সে-নারীর 'মুখ সেকালের শক্তির মতন'; 'ভোরের কল্লোল'-এর মতো; সে-নারীর 'মুখের রেখা আজো...অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন'। এখানে নারীকে অতিমাত্রায় মহিমান্বিত করেছেন জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে এসব নারী

ব্যক্তিগত প্রেম-অপ্রেম, ভালোলাগা-মন্দলাগা, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই ধরনের নারীর তালিকায় পড়বে জীবনানন্দ দাশের অত্যন্ত জনপ্রিয় (অন্তত নামের দিক থেকে) নারীনামযুক্ত কিছু কবিতার নারী। যেমন, *বনলতা সেন* কাব্যের 'সুদর্শনা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'সুচেতনা' এবং *সাতটি তারার তিমির* কাব্যের 'আকাশলীনা'। এসব কবিতায় নারী প্রকৃতপক্ষে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কহতব্যকে প্রকাশ করার জন্য প্রথাগত কাব্য-ঐতিহ্যে নারীকে রূপক-প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের যে রীতি রয়েছে, সেই রীতির অংশ হিসেবেই নারী এসব কবিতায় প্রতীক বা টেকনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'সুচেতনা' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কবিতাটির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, সুচেতনা নারী বিষয়ক কোনো কবিতাই নয়। এটি মূলত সভ্যতার মূল্যায়নের কবিতা। সুচেতনা কোনো নারীই নয়। সুচেতনা আদতে শুভচেতনারই প্রতীক–

> সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে– এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
> সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
> এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;–
> প্রায় তত দূর ভালো মানবসমাজ
> আমাদের মতো ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
> গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে। (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৭২)

'সুদর্শনা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা' সম্পর্কে একই কথা খাটে। কবির 'এসব কাব্যনায়িকা বা প্রেমিকারা বিশাল প্রবহমান জীবনের এক মাধ্যম বা প্রতীকের মতো দেখা দিয়েছে।' (আবদুল মান্নান ২০১১ : ২৫০)

নারী জীবনানন্দের কবিতায় কখনো কখনো সৌন্দর্য-সুষমার আধার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা বর্তমান কালের যাপিত প্রেমময় সম্পর্কের মধ্যে নয়। এই রূপ-মাধুর্যের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়, পুনর্মিলনে অথবা অতীত কালে; স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার মধ্যে বা বাস্তবের বাইরে তিনি যখন নারীকে আবিষ্কার বা প্রতীকায়িত করেছেন। যেমন– *বনলতা সেন* কাব্যের 'দুজন' কবিতায় নারীর রূপৈশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে। এই নারী এবং কবি অতীতে প্রেমের সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়, প্রেম ধীরে মুছে যায়', সেহেতু কবি এবং তাঁর প্রেমিকার সম্পর্ক 'ঝরে' গিয়েছে। সেই পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে আবার ক্ষণিক দেখায় সেই নারীর মুহূর্তের রূপ-মাধুর্য ধরা পড়েছে কবিতাটিতে–

> এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
> উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।

হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রানের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;–
প্রেমিকের মনে হল : এই নারী– অপরূপ– ... (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৬৫-১৬৬)

আবার 'বনলতা সেন' কবিতায় আছে নারীর চিরায়ত রূপ-মাধুর্যের চিত্র। এছাড়া এটি জীবনানন্দের নারীকেন্দ্রিক কবিতার মধ্যে সেই দলছুট কবিতা, যেখানে নারীর কল্যাণময় ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এটি আসলে স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার কবিতা। কারণ কবিতাটি মূলত দূর অতীতের স্বপ্নের মধ্যে রচিত। 'পরিবার ও দাম্পত্যে কাঙ্ক্ষিত নারীর সান্নিধ্য না পেয়ে জীবনানন্দ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সংবেদনশীল রোম্যান্টিক নারী।' (সিরাজ ২০০৯ : ৪২১) বনলতা সেন বোধ করি এই চেতনাজাত নারীসৃষ্টি; বাস্তবের কিছুতেই নয়। 'সেন-উপাধিধারিণী নাটোর নামক স্থানের অধিবাসিনী হিশেবে কবি তাঁর দয়িতাকে যতোই শরীরী ক'রে তুলতে চেষ্টা করুন-না কেন, তার উপর কেবলি লুণ্ঠিত থাকে এক অভেদ্য রহস্যের বহুস্তর আবরণ। সে হ'য়ে ওঠে স্বপ্ননায়িকা; ... (আবদুল মান্নান ২০১৪ : ২৫)

জীবনানন্দে আরেক ধরনের নারী আছে, যে বর্তমান নয়, অতীত; শুধু অতীত নয়, মৃতও বটে। এই নারীকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছেন সদর্থকভাবে। এই নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে কবির প্রেরণা আর আকর্ষণের উৎস। এই নারী কবির প্রেম-অপ্রেমের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় ভালোলাগা। এই নারীর বিরুদ্ধে কবির কোনো অভিযোগ নেই। বরং এই নারীকে উপলক্ষ করে প্রকৃতির এক দারুণ ভোগ জমে উঠেছে কিছু কবিতায়। এরকম নারীর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ করি *বনলতা সেন* কাব্যের 'তুমি', 'অঘ্রান প্রান্তরে', 'ধান কাটা হয়ে গেছে', 'আমাকে তুমি' ইত্যাদি কবিতায়–

মাটির অনেক নিচে চলে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে;
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি– তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে
আমার এমন কাছে– আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে–' (জীবনানন্দ ২০১৪ : ১৬৮)

এভাবে জীবনানন্দের কবিতায় নারীর বিচিত্র রূপ এবং বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি নারীকে সদর্থকভাবে, নিঃশর্তভাবে (unconditional) দেখতে পারেননি। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নারী সব সময় নেতিবাচক। আর ইতিবাচক নারী যেগুলো তার সবই হয় স্বপ্নজগতের নতুবা

অতীতের। কিন্তু এই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির নারীও প্রথাগত নারী-ভাবনায় সমাচ্ছন্ন। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, গভীরভাবে জীবনানন্দের কবিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী জীবনানন্দের সামগ্রিক জীবনচেতনায় বা তাঁর সমগ্র কাব্যচর্চায় সবচেয়ে কম স্থান দখল করে আছে। জীবনানন্দের কবিতায় জীবনানন্দ বরং বেশি আগ্রহী প্রকৃতি, জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, সভ্যতার সংকট এবং সংকট উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির প্রতি। জীবনানন্দের কবিতায়, এমন কি প্রেমের কবিতায়, নারীর সক্রিয় উপস্থিতি খুবই কম। এমনকি যেগুলি গভীর প্রেমের কবিতা সেখানেও নারী প্রায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় প্রকৃতির প্রযোজনায় বেদনার গভীর ভোগই মুখ্য হয়ে উঠেছে অথবা প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কিত আধুনিক সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় নারীকে যতটুকুই রূপায়িত করেছেন তাতে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক নারীভাবনার বাইরে তিনি যেতে পারেননি অথবা বলা যায় যাননি।

টীকা

১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগুলো জীবনচেতনা আর প্রকাশরীতির দিক থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নতা লাভ করেছে। তাঁর মূল কবিস্বভাব প্রথম সুস্পষ্টভাবে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সাথে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে। এরপর *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবী* কাব্যে তাঁর এই কাব্যস্বভাব অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হলেও মূল সুরটি মোটামুটি অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু *সাতটি তারার তিমির* থেকে তাঁর কাব্যস্বভাবে বেশ বড় পরিবর্তন আসে। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, *বনলতা সেন*-এর পর থেকেই তাঁর কবিস্বভাবে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জীবনচেতনা আর প্রকাশরীতিতে *বনলতা সেন* যদি জীবনানন্দের কাব্যপ্রবাহের একটি শিখর হয়, তাহলে *সাতটি তারার তিমির* তার আরেকটি চূড়া, প্রথম কবিতাগ্রন্থে জীবনানন্দ প্রেম-প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে সমাজ-রাজনীতি-চেতনার। *সাতটি তারার তিমির*-কে তো বলাই হয় 'তাঁর পৃথিবীর বিপরীত পৃথিবী'। মোট কথা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবনানন্দ দাশ একটা বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। (আবদুল মান্নান ২০১৫ : ৪১৪, সৈকত ২০১৪ : ১৫-১৬) ।

২. কিন্তু আত্মহত্যা বা মৃত্যু সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। এই ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায় ভূমেন্দ্র গুহ (২০১১)-এর এক বর্ণনায়। ভূমেন্দ্র গুহ এবং তাঁর বন্ধুরা কোথায় থাকেন একথা একদিন জীবনানন্দ দাশ প্রশ্ন করেছিলেন ভূমেন্দ্রকে। তখন তিনি বাড়ির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, একটা ভূতুড়ে বাড়িতে থাকেন। কারণ সে বাড়ির এক যুবতী মেয়ে গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। এবং কথিত ছিল যে, আত্মহত্যাকারী মেয়েটি 'সারা রাত বাড়িময় একা-একা ঘুরে-ঘুরে' কাঁদে। জীবনানন্দ দাশ তখন ভূমেন্দ্রকে মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞেস করলে এর উত্তরে ভূমেন্দ্র বলেছেন, 'ও-রকম বয়সী মেয়েদের আত্মহত্যার কারণ হাতে গুনে বলে দেওয়া

যায়।' উত্তরে জীবনানন্দ যা বলেছেন তাতে আত্মহত্যা বা জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়েছে। জীবনানন্দ বলেছেন–

> কথাটা মেয়েদের বা ছেলেদের নয়, কোন বয়সের সেটাও হয়তো নয়, মৃত্যু তো তোমার জানাশোনা নিজের জীবনের মধ্যে একমাত্র একটাই শাশ্বত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা, যা নিজে থেকে ঘটবে বা তুমি নিজে ঘটাবে। কেন ঘটাবে, তুমি জীবনকে– মোটা কথায় সদর্থক বেঁচে-থাকাকে– ভালবাস বলে, রোগেশোকে সুখে-দুঃখে সার্থকতা–অসার্থকতায় ক্রমাগত বেঁচে-থাকতে চাও বলে, এই সবে তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনও চিড় তুমি সহ্য করতে পার না বলে; তোমার ভালবাসার জিনিসটাকেই তুমি তখন ভেঙে ফ্যালো, শিশুরা প্রগাঢ় সৎ ভাবাবেগে যা করে ফ্যালে, কেন করে, না জেনেই করে। ... এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঠিক জীবন-লালসারই উলটো পিঠ। (ভূমেন্দ্র ২০১১ : ১৩)

কিন্তু জীবনানন্দের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতটা খেয়াল করা জরুরি। তিনি মৃত্যু বা আত্মহত্যা সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তখন, যখন তাঁর কবিতা সম্পর্কে কলকাতার প্রভাবশালী সমালোচকরা অধিকাংশ বলেছেন যে, জীবনানন্দের কবিতা অন্ধকারের কবিতা বা মৃত্যুঘনিষ্ঠ নেতিবাচক কবিতা। আর জীবনানন্দ ওপরের বক্তব্য রাখছেন তাঁদের উদ্দেশে, যাঁরা জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কিত সমালোচকদের নেতিবাচক বক্তব্যের ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা শুধু এর বিরোধীই নয়, জীবনানন্দ সম্পর্কিত নেতিবাচক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁদের সম্পাদিত পত্রিকা *ময়ূখ*-এ লেখা ছাপানোর জন্য জীবনানন্দের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে তা পায়নি।

৩. অবশ্য কবিতায় বাস্তবের বোধ সঞ্চারিত করে তোলার জন্যেও 'শরীর' ও 'দেহ' শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। কারণ রোমান্টিকদের কাজ মূলত তীব্র আবেগ, কল্পনা আর অধরাকে নিয়ে বেশি। আর রবীন্দ্রোত্তর যুগের আধুনিক কবিরা কবিতাকে বাস্তবের মোড়কে মোড়ানোর এক ধরনের অঘোষিত প্রত্যয় নিয়েছিলেন। একারণে নায়িকার একটি অবয়বগত ধারণা তাঁরা কবিতায় জারি রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

৪. এছাড়া 'জীবনানন্দের দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে তিনি দিল্লীতে বেশ্যাবাড়ি গিয়েছেন'। (আকবর ২০১৬ : ৭৫) এর সঙ্গে কবিতার আরো কিছু লক্ষণ থেকে আকবর আলি খান (২০১৬) 'বনলতা সেন' কবিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনুমান করেছেন যে, বনলতা নামক নারী বারবনিতা হতে পারে। 'দুদণ্ড শান্তি' এবং কবিতার অপরাপর ইঙ্গিত থেকে তিনি এও দাবি করেছেন যে, নাটোর যে বারবনিতাদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল তাও জীবনানন্দ জানতেন। কিন্তু নারী এবং বারবনিতা বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের এতটা আগ্রহ ছিল – যতটা আকবর আলি খান বলেছেন– এমন সাক্ষ্য কোথাও দেখা যায় না। বরং অধিকাংশ জীবনানন্দ-গবেষক মনে করেন যে, নারী সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি 'সাত্ত্বিক পুরুষ' ছিলেন। দিল্লীতে 'বেশ্যাবাড়ি' যাওয়ার বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দের সামগ্রিক জীবন-যাপন আর চিন্তাচেতনার ধরন দেখে মনে হয় না যে, তিনি নারী বিষয়ে বহুগামী ছিলেন বা 'অনাচারী' ছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

আকবর আলি খান (২০১৬)। *চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'*, ৪র্থ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১১)। *শুদ্ধতম কবি*, ৩য় পাঠক সমাবেশ সংস্করণ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৪)। 'বনলতা সেন', *বনলতা সেন : ষাট বছরের পাঠ* [সম্পা. সৈকত হাবিব], ৪র্থ মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৫)। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জহর সেনমজুমদার (১৯৯৯)। 'আজকের জীবনানন্দ, কালকের জীবনানন্দ', *অনুষ্টুপ*, ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ, জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা

জীবনানন্দ দাশ (২০১৪)। *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ], ত্রয়োদশ মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯২)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, ৫ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৬)। *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

বিরাম মুখোপাধ্যায় (১৪০১)। 'অগ্রজ কবি জীবনানন্দ', *কোরক*, জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, অনন্যা, ঢাকা

ভূমেন্দ্র গুহ (২০১১)। *আলেখ্য : জীবনানন্দ দাশ*, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, অবসর, ঢাকা

মিনু সরকার (১৪০১)। 'ঘরোয়া জীবনানন্দ', *কোরক*, জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা

সিরাজ সালেকীন (২০০৯)। 'জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে নারী : বাস্তব ও বোধ', *জীবনানন্দ দাশ : জীবন ও সাহিত্য* [সম্পা. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মিজান রহমান], কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৭), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সৈকত হাবিব (২০১৪)। *বনলতা সেন : ষাট বছরের পাঠ* [সম্পা. সৈকত হাবিব], ৪র্থ মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৬)। *জীবনানন্দের শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ*, ঐতিহ্য, ঢাকা।